দৌড়ের মধ্যে আছি

আজাদ আলম

ফাউন্টেন কোর্টের কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে ত্রস্ত গতিতে ডানে টার্ন নিল সে। হুড সহ ওভার কোট পরা ছোটখাটো লোকটির কানে মোবাইল লাগানো। ঘড়ির দিকে তাকালো দু'বার। রুদ্ধশ্বাসে হাটার গতি আরো বেড়ে গেল। বুক টান করে হাঁটার চলন দেখে বুঝতে বাকি রইল না এ আমার বহুকালের পরিচিত বন্ধু খাম্বা। খাম্বা আমাদের দেয়া খাজুরে নাম। ওর আসল আদুরে ডাক নাম বাপ্পা। কি করে বাপ্পা খাম্বা খেতাবে অলংকৃত হলো সেই কাহিনী দিয়েই গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

ভর্তি পরীক্ষা, রেজাল্ট আর অ্যাডমিশনের জন্য কলেজে আসা যাওয়া করার মধ্য দিয়ে ক্যামন করে আমাদের সাত জনের একটা গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে। আমরা ছয় জন উত্তর বঙ্গের আর একজন দক্ষিণ অঞ্চলের। আসাদুল, আজাদুল, নজরুল, খাইরুল, প্রভাত, জিকরুল আর সাদেকুল। ক্লাসে আমরা সবাই এক বেঞ্চে বসতাম। আমাদেরকে শতভাগ 'উল' গোত্রভুক্ত করতে গিয়ে বাংলার সুলতানা ম্যাডাম প্রভাতকে প্রভাতুল নামে ডাকার প্রস্তাব দিয়ে আবার নিজেই সেই প্রস্তাব তুলে নেন । ক্ষত্রিয়দের নামের শেষে 'উল' আছে কিনা এ নিয়ে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলেন ম্যাডাম। পরে যখন আবিষ্কার করলেন আসলে প্রভাত সমীর মীর বংশীয় খাঁটি বাঙ্গালী মুসলমান, সেদিন থেকে আদর করেই সুলতানা আপা প্রভাতকে মীর প্রভাতুল ডাকতো। আদরের বৃহত্তর কারণ ম্যাডাম মীর পরিবারের বউ ছিলেন। 'উল' সম্প্রদায়ের দলপতি বা রুলার কে জানতে চাইলে আমরা সমস্বরে বলে উঠেছিলাম 'খাইরুল'। বিশাল-দেহী সাদেকুল, তর্কবাগীশ, সুদর্শন নজরুল আর মীর বংশীয় প্রভাতুল থাকতে দলের একমাত্র দক্ষিণ বঙ্গীয় মৃদুভাষী খর্বাকৃতির খাইরুল আমাদের রুলার শুনে সুলতানা ম্যাডাম হাসিতে ফেটে পরতে শুধু বাকি ছিলেন। "এতটুকু যন্ত্র মাঝে এত শক্তি রয়!" ম্যাডাম হাসতে হাসতে কবিত্ব করেন। আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে ধর্মভীরু তরুণ উদীয়মান কবি জিকরুল অন্ত মিল রেখে জবাব দিল, " বিধাতার ইচ্ছায় সব কিছু হয়।"

ইডেন কলেজের উলটো দিকের সরকারী বাসাগুলোতে খাইরুল এবং সাদেকুলের বাস। পাশাপাশি ফ্লাটের বাসিন্দা। খাইরুলের বড় ভাই জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। সাদেকুলের দুলাভাই একজন বড় আমলা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর। সাদেকুল লম্বায় ৬ ফুটের উপড়ে আর খাইরুল মতিন বাপ্পা পাঁচ এর নীচে। বাপ্পা বেশ চুপচাপ ছেলে। কথা বলে মেপে মেপে। শব্দ প্রয়োগে গুরু চণ্ডালিকার দোষ আছে। এই দোষ আর বানান ভুলের কারণেই এস এস সি তে বাংলা দুই পেপার মিলে নম্বর পেয়েছিল ৮২। পাচঁ সাবজেক্টে ৯০ এর উপড়ে মার্কস পেয়েও মেধা তালিকায় ২০ এর মধ্যে ছিল না। রেজাল্ট দেখে বাপ্পার জীবনে একবারই মুখ দিয়ে অকথ্য গালি বের হয়ে গিয়েছিল প্রায়। মায়ের ভাষা বাংলা বলে মা তুলে গালিগালাজ টা গলাতেই আটকে গেছে। সাদেক ছাড়া বাপ্পার দুই পা এক হাতের বেশি এগুতে চায় না। ওরা যখন কলেজে ঢুকতো, মনে হতো বড় ভাই পিচ্চি ভাইটাকে হাত ধরে স্কুলে নিয়ে আসছে। দক্ষিণের অঞ্চল খুলনার এই খাইরুল কে নিয়েই আমাদের কলেজ জীবনের অনেক কোলাজের সৃষ্টি। আমাদের জন্য আশীর্বাদ ছিল বাপ্পা । সেই ইয়ারে অংক আর পদার্থে ওর সমকক্ষ কেউ ছিল বলে আমার জানা নেই। কি প্রাক্টিকালে, ড্রয়িং এ, স্টাটিক্স, ডিনামিক্স বা ক্যালকুলাসে আমরা কেউ আটকে গেলে সাহায্যের হাত যেনো বাড়ানই থাকতো। পোক্ত খাম্বাকে শক্ত করে ধরে থাকাতে শত গাফিলতি করেও ফেল মারিনি। বাপ্পা আমাদেরকে পেছাতে দেয় নি। তুখড় মেধা সম্পন্ন এই বিজ্ঞ ছেলেটির তাৎক্ষনিক বিচার বুদ্ধি পড়াশোনার বাইরেও কাজে লাগিয়ে উৎরে গিয়েছি অনেকবার। তাই ওকে দলনেতা বানাতে আমরা কেউই কুণ্ঠাবোধ করিনি। আমরা ওকে ক্ষণজন্মাদের তালিকায় রেখেছিলাম।

মজিবর সারের প্রথম ক্লাস। মুনির চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' পড়াবেন। পরিচয় পর্ব দিয়ে তাঁর ক্লাস শুরু। নাম ধাম স্কুলের নাম স্থাপিত সন পারলে বাপের নামটাও জিজ্ঞেস করছেন। ক্লাসের ডান পাশের ৭ নম্বর সারিতে বসতাম আমরা। সব ক্লাসেই এটা আমাদের নির্ধারিত বেঞ্চ ছিল। প্রথমে আসাদ, এরপরে আমি, নজরুল, খাইরুল, সাদেক, জিকরুল এবং প্রভাত। মজিবর সার নাম ধাম জিজ্ঞেস করছেন। সামনের তিন সারি দখল করে আছে ঢাকা ল্যাবরেটরি, ওয়েস্ট এন্ড, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি এরকম ঢাকার কয়েকটা জাঁদরেল স্কুলের ছাত্ররা। সার বেশ আগ্রহ করে ওদের পরিচিতি শুনছেন। ফাঁকে ফাঁকে তাদের পূর্বসূরিদের কৃতিত্বের কথা সগৌরবে ফলাও করে সবাইকে

জানাচ্ছেন। সারের ভাষায় তারাই বাংলাদেশের ক্রিম। গত পাচঁ বছর ধরে এই কলেজের শীর্ষ অবস্থানের পেছনে ঐ সমস্ত স্কুলের অবদান দীপ্যমান।

মানিকগঞ্জের কেউ আছে কিনা খোঁজ নিলেন সার। কাউকে পাওয়া গেল না। 'এ' সেকশনের ডজন-খানেক ছেলে মানিকগঞ্জের। জানালেন সার। প্রলম্বিত ওষ্ঠে নিঃশব্দ হাসি ধরে রাখতে পারছিলেন না। বুঝতে বাকি রইলো না মজিবর সার মানিকগঞ্জের মানিক।

নজরুল মান সম্ভ্রম সচেতন মুখরা ছেলে। এইসব ব্যবচ্ছেদ, পক্ষপাতমুলক ইঙ্গিত ওর ভাল লাগছিল না। ঢাকার ওরা দুধের ক্রিম আর বাইরের আমরা জলের ফেনা? ব্যাক বেঞ্চার? না হয় পিছনের বেঞ্চে বসে আছি। উসখুস করছিল কিভাবে সারের মুখ বন্ধ করা যায়।

আমাদের বেঞ্চের পরিচিতি পালা। আসাদের চার বাক্যে বলা শেষ। আসাদুল ইসলাম। বাড়ি দিনাজপুর। স্কুল ফুলবাড়ি। স্থাপিত সন অজানা । আমি নাম বললাম, বাড়ি, স্কুল নীলফামারী, স্থাপিত সন ১৮৮৮।

সার বললেন, "এই দুই স্কুলের একটারও নাম আগে কখনো কর্ণগোচর হয় নি। আসলে সার তেমন কান দিচ্ছিলেন না। বলার জন্য বলা। সারের উত্তরবঙ্গের প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব ভাল ঠেকছিল না নজরুলের।

নজরুলের টার্ন। দাঁড়িয়েছে ঘাড় ত্যাড়া করে, কিছু বলছে না।

নজরুলের ত্যাড়া ভাবে দাঁড়ানো দেখে সার বুঝতে পেরেছে, এ ছেলে ত্যাঁদড় না হয়ে যায় না।

"বাড়ি কোথায়, জন্মস্থান?" সারের গলার স্বর ঝাঁঝালো। প্রথম শটেই বেড়াল নিধনের প্লান।

"সার, মানিকগঞ্জ ঢাকা।"

আমরা হাঁ হয়ে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি। দিনাজপুরের নজরুল কি বলে?
সার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

"একটু আগে জিজ্ঞেস করলাম, মানিকগঞ্জের কেউ আছো কিনা, সাড়া দিলেন কেন?"

"মানিকগঞ্জ আমার তো স্থায়ী ঠিকানা না। স্থায়ী ঠিকানা ভবের হাট, দিনাজপুর। মানিকগঞ্জ নানার বাড়ি। ইষ্টের ইচ্ছায় ওখানেই ভূমিষ্ঠ। আপনি জন্মস্থান জানতে চেয়েছিলেন সার।"

সারের রাগের মাত্রা বাড়ছে। এ ছেলের কথা বার্তায় পিতলামি। বেয়াদবি।
"স্কুল?" সারের গলা সপ্তমে ।

শেয়াল মারি প্রাইমারি, হাইস্কুল ...আরো জোরে বলতে যাচ্ছিল নজরুল হাই স্কুলের নাম।

সার তারস্বরে নজরুলকে থামিয়ে দিল।
"থামো, কানের পর্দা ফাটানো চিৎকার করতে কে বলেছে? শেয়াল মারো, প্রাই মারো আর প্রতিদিন মারো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এস এস সই পাশ করেছ কোত্থেকে"?

"দিনাজপুর ত্রিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে, স্থাপিত সন ১২৬১। সার, আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি থামিয়ে দিলেন।"

দাঁড়িয়ে গেছেন মজিবর ছার, ঝাল ঝাড়বেন এবার অঝোরে, “চাপা মারার জায়গা পাও না। স্থাপিত সন ১২৬১ এ্যাঁ?”

“শোনো ভবের হাটের কৃতি সন্তান, এটা বাংলাদেশের সেরা কলেজ, শেয়াল মারার কলেজ না। পিতলামি আর চাঁপা মারার জায়গা নয় এটা। ১২৬১ সালে উত্তর বঙ্গ কেন সারা বঙ্গে কোন হাই স্কুল ছিল না। কান খুলে শুনে রাখো।”

“বাংলা ১২৬১ সার।” নজরুলের নির্লিপ্ত উত্তর।

ক্লাসে পিন ড্রপ সাইলেন্স। সরের ফর্সা মুখ রাগে ক্ষোভে আর লজ্জায় লাল। সারা শরীর তেতে আছে। নজরুলকে ইশারায় বসতে বলে সার খাইরুল কে দাঁড় করালো। এক আঙ্গুল উঁচিয়ে। খর্বাকৃতির খাইরুলের হাত পা এবং ঠোঁট কাঁপাকাঁপি শুরু হয় গেছে আগে থেকেই। মনে মনে নজরুলের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করা শেষ। ক্যান যে শালা সারের সাথে লাগতে গেলি? সার রক্তাক্ত প্রান্তর পড়ানো শুরু করার আগেই ক্লাসের ভেতরে রক্তারক্তি অবস্থা।

নাম?

“খাইয়রুল মতিন বাপ্পা, সার”।

“তুমি কি চাপা টা মারবে শুনি?” সারের তির্যক প্রশ্ন।

নজরুলের সবিনয়ে আপত্তি, “আমি চাপা মারি নি সার।”

“তুমি চুপ কর” বলতে যাবেন এর মধ্যে বিকট হাঁচি এসে ‘কর’ শব্দটি নাক থেকে নির্গত সর্দির সাথে মিশে গেল সরের। বাম করতল দিয়ে সর্দি মাখা মুখ ঢেকে ডান হাতে পাঞ্জাবির পকেটে রুমাল খুঁজছেন। পাচ্ছেন না। ঠোঁটে মুখে লেপটানো লম্বা সর্দি সামলাতে সার ক্লাসের বাইরে চলে গেলেন। পাঁচ মিনিটের বেশি। সারের ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই। খাইরুল দাঁড়িয়েই আছে আর কাঁপছে।

“দাঁড়িয়ে আছিস ক্যান খাম্বার মত, বস শালা।” নজরুল খাইরুলের হাত ধরে নীচে টান দিল।

আমি বললাম,” খাম্বার মত কিরে, ওতো খাম্বাই”। খায়রুল মতিন বাপ্পা। খা, ম, বা, খাম্বা। রক্তে ভেজা নিস্তব্ধ বধ্য ভূমিতে হাসির রোল পরে গেল। সেই থেকে আমাদের দলপতির নাম খাম্বা।

আসল গল্পে ফিরে আসি।
পিছন দিক থেকে বেশ জোড়েই ডাক দিলাম, “কিরে খাম্বা, যাস কই? মনে হচ্ছে বেশ ব্যস্ত জরুরী সংবাদ ছিল।”
ইনারশিয়া অফ মোশনের কারণে খাম্বা দশ মিটার দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

“দোস্ত দৌড়ের মধ্যে আছি। তুইতো বেশ আছিস হাত পা ছাড়া। মেষ রে মেষ তুই আছিস বেশ।”

আমি খাম্বা ডাকলেও আমাকে মেষ বলতে ছাড়েনা। আমি মেষ রাশির জাতক বলে ও আমার নাম দিয়েছে মেষ।
“হাত পা ছাড়া না, বল হাত পা ঝাড়া। গুরু চণ্ডালিকার দোষ তোর আজও গেলনা”।

“অই হোলো আর কি। আমি মিন করছি তুই হাত পা ছেড়ে দিব্বি আরামের আরাম করছিস আর আমি এই যে সকাল সন্ধ্যা দৌড়ের মধ্যে, বউ এর তাড়া খেয়ে দৌড়, ছেলেকে কোচিং থেকে আনতে দৌড়, মেয়েকে আনতে ইস্টগার্ডেনে দৌড়, ব্রেনটাকে শান দেয়ার জন্য লাইব্রেরির দিকে দৌড়, দাওয়াত খাওয়ার জন্য দৌড় আর দাওয়াত দেওয়ার জন্য বাজারে দশ বারোবার দৌড়, দৌড়া-দৌড়ির আর শেষ নাই রে। তোরা তো বিয়ের দৌড়ে ফার্স্ট হয়ে, বাচ্চা কাচ্চা বড় করে এখন আরামে আছস আর আমি ধরাটা খেলাম।”

আমি আর কথা বাড়ালাম না।
“যা দোস্ত, দৌড়া। দৌড়ের মধ্যে আছিস যখন। নিউজ টা পরে দিব।”

ওর নিউজ শোনার সময় নাই। সত্যি সত্যি খাম্বা দৌড় দিল। আমি পিছন পিছন হাঁটছি। বাপ্পার আক্ষেপ দেরিতে বিয়ে হওয়াটাই তার কাল। পিছনে পরে থাকার নেমেছিস। এখন সবাইকে ক্যাচ আপ করার জন্য নাভিশ্বাসি দৌড় দৌড়াতে হচ্ছে। বিয়ের পিড়িতে বসার জন্য এক পায়ে খাড়া থাকলেও হয় নি দুটো কারণে। ছেলের সবই ভাল শুধু লম্বায় পাছের নীচে আর গায়ের রঙ অনুজ্জ্বল শ্যামলা। জন্ম সূত্রে পাওয়া এই দুই বিয়োগান্তক বৈশিষ্ট্যের কারণে ধরা খেয়ে নিজেই বিয়ে পিছিয়ে দিল। আন-প্যারালাল বারে বাঁদর ঝোলা ঝুলে ঝুলে আরো দু ইঞ্চি লম্বা হওয়ার ফিকির কম করে নি। চেষ্টা করেছিল ফেয়ার এন্ড লাভলি মেখে মুখ মণ্ডলে উজ্জ্বলতা আনার। কাঁচা হলুদ আর আলোভেরার রস মেখেছিল কয়েকদিন। কাজ হল না। বিয়েটাই খামোখা পিছিয়ে গেল। সেই সাথে আনুষঙ্গিক সব কিছু। সংসার, ছেলে, মেয়ে বাড়ি ঘর ইত্যাদি। কপালের কি যে ফের, খাম্বার বিয়ে দেড়িতে হলে হবে কি, বউয়ের বিয়ে হলো বয়সের আগেই। বউ টিন এজের। অষ্টাদশী বউয়ের মতিগতি বুঝতে বুঝতে গেল আঠার বছর। তার কথায় হা বল্লেও দোষ। আইসক্রিমের মত এত তাড়াতাড়ি গলে যাই কেন আবার না বললেও ফোঁসফোঁসানি। কি কঠিন পাষাণের সাথে ঘর করে সে, মুখ দিয়ে হাঁ বের হতেই চায় না! কইলজায় হানা না দিলে নাকি হাঁ বের হয় না। শাঁখের করাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।

বোটানি রোড আর হাই স্ট্রীটের টি জাঙ্কশনে বাপ্পার সাথে আবার দেখা। হাতের ইনডেক্স আঙ্গুল একবার ডানে আর একবার বাঁয়ে পয়েন্ট করছে।

বললাম,“কিরে দাঁড়িয়ে পরেছিস, ট্রাফিক পুলিশের মত আঙ্গুল লেফট রাইট করছিস ক্যান?”

“বুঝে উঠতে পারছিনা, কোন দিক দিয়ে গেলে টাইম সেভ হবে। পোস্ট অফিসের কাজ সেরে, রতন ভাই এর দোকান থেকে মশলা কিনে, বেস্ট অ্যান্ড লেস থেকে মোজা কিনে বাসায় আসতে পারি অথবা উলটোটাও করা যায়, বেস্ট এন্ড লেস, মশলা, দেন পোস্ট অফিস। না, আগে পোস্ট অফিসের কাজ সারি, লম্বা লাইন দেখলে লাস্টে সারবো পোস্টাল টাস্ক।”

এই ডিসিশন নিতে গিয়ে অলরেডি তার চার পাচঁ মিনিট চলে গেছে। অতিরিক্ত অস্থিরতা দেখে বুঝলাম ওর ব্রেনের ব্যাটারি ফ্লাট আউট। তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। থার্মাল রানয়্যাওয়ে হওয়ার সম্ভাবনা। এতে ব্রেন সেল ড্যামেজ হবে। সর্ট সার্কিটও হতে পারে। ওকে থামানো দরকার।

“দোস্ত,ব্রেক দে, মনে হয় সারাদিন অনেক দৌড়ের মধ্যে ছিলি। সামনে কলাম্বিয়ান বোগোটা কফি। চল কফি খাই।”

জানি, না করতে কষ্ট হবে। কফিতে ওর বেশ আকর্ষণ।

“খেতে তো ইচ্ছা করছে, বোগোটায় বসলে তো বাকি কাজগুলো হবে না।”

আমি বললাম,“সব হবে, তুই পোস্ট অফিস সেরে, রতন ভাই এর দোকান থেকে মশলা আর বেস্ট অ্যান্ড লেস থেকে ছেলের জন্য মোজা কিনে আয় আমি ব্যাংক থেকে আসছি। বোগোটায় বসে কলাম্বিয়ান কফি খাবো।”

আমি ব্যাংকের কাজ সেরে বোগোটায় বসে আছি। বাপ্পার জন্য অপেক্ষা। দুই কাপ ফ্লাট হোয়াইট কফির অর্ডার দিলাম। একটাতে ডাবল শট উইথ ফোর সুগার। বাপ্পা চিনি খায় বেশি।

১৫ মিনিট পরে বাপ্পা হাজির। কাঁধে সাইড ব্যাগ। হাতে কিছু কাগজ পত্র।

“সরি দোস্ত, বউকে হাফ ম্যানেজ করে আসতে হল। ওয়াশিং ম্যাশিনটা অন করে, বাজারের নাম করে বের হলাম। তুই মনে কিছু করিস না, কফি খেতে খেতে আমি কিছু নোট করব আর কিছু পেপারে হাই লাইট করতে হবে। গল্প চালিয়ে যাবি তুই। ইন্টার একশন করতে আমার প্রব্লেম হবে না। এখন বাজে পাঁচ টা। ঘণ্টা খানেক বসব তোর সাথে তার পর লাইব্রেরী। কাঁচা বাজার সেরে মেয়েকে ন’ টায় পিক করতে হবে ইস্ট গার্ডেন থেকে। লাইফ ইজ টাইট।”

“এগুলো কিসের পেপার”? আমি জানতে চাইলাম।

“আর বলিস না, যৌবন কালের লালিত সুপ্ত স্বপ্নটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সুপারভাইজার মিলে গেল, অফিসের থেকে পেইড স্টাডি লিভ পাব ১০ ঘণ্টা উইকলি। আগামী সপ্তাহে প্রপোজাল জমা দিতে হবে। এ জন্য বেশ দৌড়ের মধ্যে আছি। এদিকে ছেলের HSC। মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে না, ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়তে চায়। এ নিয়ে বাসায় মহা হৈ চৈ আর বৌ এর স্ট্যান্ডিং অর্ডারগুলো তো আছেই।“

“অর্থাৎ এতো কিছু ব্যারিয়ার থাকা ষত্বেও PHD তা হলে করছিস। তোর না কয়েকদিন আগে দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে পায়ের হাড় ড্যামেজ মানে PHD হল। এবারে কি পার্মানেন্ট হেড ড্যামেজ করবি?”

“সব দিক ম্যানেজ করে এগুতে পারব ইনশাল্লাহ। তবে খাটনিটা বেশি হবে। I have to run even faster to find some slot to study. বউ তো আর ছার দিবে না।”

“বাচ্চারা?”

“They will be managed somehow.”

আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি কলেজ জীবনের বাপ্পা নামের বন্ধুটি মারাত্মক ধরনের বুদ্ধিমান। শরীরটা ছোট খাটো কিন্তু মাথা বেশ প্রকাণ্ড। সামনাসামনি দেখা হলে বুদ্ধিমত্তার তো কোনো বিচ্ছুরণ দেখবেন না। মুখমণ্ডলে কোন জেল্লা নেই। চোখের মনি সারাক্ষণ পুরু চশমায় ঢাকা থাকে। কথা বললে বুঝতে পারবেন তার ব্রেনের তীক্ষ্ণতা। খুব গুছিয়ে কথা বলে। পাঁচ মিনিটে বিগ ব্যাং থিওরির অসারতা, ১০ মিনিটে মিডল ইস্টের রাজনীতি এমন ভাবে বোঝাবে, আপনি শুধু হা হয়ে ভাববেন, এতটুকু যন্ত্র মাঝে এত বুদ্ধি রয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস PHD বা POST DOC করা ওর জন্য কোন ব্যাপার না। শুধু সময়ের ব্যাপার।

আমি বললাম, “ভাবী জানে তো”।

“জানে তবে বলেছি পাচঁ সালা পরিকল্পনা। তার আগেই শেষ হবে। ফ্যামিলি লাইফ এফেক্ট হবে না।”

“ভাবী কি বলল”?

ওর ড্রেডফুল এ্যানছার,
“হবে কি অলরেডি ইনফেকটেড, কবরে তোমার হাড্ডির সাথে PHD র সার্টিফিকেট বেধে দিব। ইহ জীবনে তো আর বেশি দিন নড়াচড়া করতে পারবে না। গলার টোনটা সুবিধের মনে হলো না।”বাপ্পার মুখে শুকনো হাসি।

“মনে তো হচ্ছে সী ইজ রেডি ফর হেডবাটিং।”

“না, মনে হয় না, শুধু কথা বলে বেশি। প্রচ্ছন্ন সাপোর্ট আছে। এখন তো বয়স হয়েছে, বুদ্ধিও বেড়েছে। আগের মত ছেলেমানুষি করে না। উই আর ইন গুড টার্ম নাউ এ ডেজ।”

বিয়ের পরের বাপ্পার সাথে বিয়ের আগের বাপ্পার আকাশ পাতাল তফাত। যে বন্ধুটি বন্ধুর জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল। কলেজ লাইফের সেই ধীর ধৈর্যশীল অথচ আড্ডাবাজ ছেলেটিকে এখন ৬ মাসেও একবার দেখা যায় না। ইদানীং মোবাইলেও পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। ফোন করলে ওপাশ থকে শব্দ ভেসে আসে সর্বসাকুল্যে পাঁচটি, লিভ ইওর নেম এ্যান্ড নাম্বার। সংক্ষিপ্ত রেকর্ডেড ম্যাসেজ। সময় বাঁচিয়েছে এখানেও। সময়ের তার বড় অভাব।"

আমাদের 'উল' সম্প্রদায়ের কে কোথায় ক্যামন আছে বাপ্পাকে জানালাম।

"সাদেকুল ফোন করেছিল সিঙ্গাপুর থেকে, জানতে চাইল তোর কথা। সে বারকয়েক ফোন করেছিল তোকে। একই রেকর্ড বেজেছে। লিভ ইওর নেম এ্যান্ড নাম্বার। নজরুল জানে তুই সন্যাসী হয়ে গিয়েছিস। অস্ট্রেলিয়ার ঝোপে জঙ্গলে থাকিস, মোবাইলের কভারেজ নাই তাই তোকে পাওয়া যায় না। জিকরুল স্বপ্নে দেখেছে, তুই প্রশান্ত মহাসাগরের ছোটছোট দ্বীপগুলোতে দীনের নবী আলা কাজে ব্যস্ত। প্রভাত তোর উপর বেশ অসন্তুষ্ট। ওর মেয়ের বিয়েতে কার্ড পাঠাল। গেলি না তো বটেই, ফোন পর্যন্ত করিস নাই। সে সময়তো তুই দেশেই ছিলি।"

"হ্যাঁ, কেমন করে যে কার্ডটা হারিয়ে ফেললাম আর পুরো ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেলাম। মাথায় আসছে না। আজকাল প্রায় স্মৃতি-ভ্রম হচ্ছে। একটু মনে হয় দৌড় কমাতে হবে।"

"যাকগে আমি ওদেরকে আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি। তুই ৫০+দের ম্যারাথন দৌড়ে আছিস। তোর যে এখন বদ্ধমূল ধারনা, বসে থাকলে ভাগ্য বসে যায়। শুয়ে থাকলে কপাল কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। তাই তোর এই অবিরাম দৌড়।"

"এটা অবশ্য বাড়িয়ে বলিস নাই। দে আর এক কাপ কফির অর্ডার। আসাদ এখন কোথায় রে?"

"ও এখন রংপুরে। নানা ভাই আসাদ। মেয়ের ঘরের নাতনী। নানান ধরনের পুতুল দিয়ে তার অফিস ঘর সাজানো। ফেস বুকের ছবি দেখে তো তাই মনে হলো। মেয়ে কুয়ালালামপুরে থাকে। মেয়ের জন্য একসময় ঘোড়া ছিল। সেই পৃষ্ঠদেশ এখন নাতনীর জন্য রেডি।"

বাপ্পা কফিতে চুমুক দিচ্ছে ধীর লয়ে। পৃথিবীর অনেক মধুর মধুর খবর তার অজানা। নিজেই খেদোক্তি করলো।

"দোস্ত আসলে আমি বেশি বেশি দৌড়ের মধ্যে আছি। কি এক ইঁদুর দৌড়ের মধ্যে পরে নিজেই দলছুট হয়ে গেলাম। পেতে পারি কিন্তু পাচ্ছি না, এই না পাওয়ার তাড়না আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার মনেই পরে না কবে সবাই মিলে নিজের মত করে কোথাও পিকনিক করেছি। ছেলেটার বোলিং এ শূন্য রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত এসেছি। আমার কোথায় যেন হিসেবের গোলমাল হয়ে গেছে।"

"গোলমাল একটাই, তুই দৌড়ের মধ্যে আছিস, এখন সেটা স্টপ করে মাঝে মধ্যে দৌড়া। থেমে থেমে আশে পাশে তাকা, বনডাই বীচে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে বাতাস নে। ভাবী বাচ্চাদের সাথে সময় কাটা। কফি হাউজে বসে মাঝে মাঝে আড্ডা দে। ভালো লাগবে।"

৮ বেজে গেছে অলরেডি, বাপ্পার সেদিকে খেয়াল নেই।

"জিকরুল এখন কোথায়, কয়েক বছর আগে শুনেছিলাম ও মালয়েশিয়ায় ছিল।"

"ও এখনো কুয়ালালামপুরে। আসাদ বেড়াতে আসছে সেখানে এই ডিসেম্বরে। ওর নাতনীর তৃতীয় জন্মদিন। সাদেক সিঙ্গাপুর থেকে আসবে ওখানে। প্রভাত আর আমি মালয়েশিয়া হয়ে দেশ যাব প্লান করেছি। নজরুলকে বললেই ছুটে আসবে। যেখানেই থাকুক না কেন। আমার উপর দায়িত্ব পরেছে তোকে ম্যানেজ করা। এ জন্যেই বলেছিলাম তোর সাথে কথা আছে। 'উল' সম্প্রদায়ের এই মিলন মেলায়, এর লাইফ লং নেতা খাইরুলের উপস্থিতি সবার একান্ত

কামনা। সময় বের করে যদি আমাদের সাথে কিছুটা সময় কাটাস। ভাবীকে বিয়ে বার্ষিকীর সারপ্রাইজ উপহার দিতে পারিস।”

“ডিসেম্বরের ২০ তারিখের দিকে ডেট ফিক্স করা যায় কি”? ওর চোখে মুখে উৎসাহ।

“হ্যাঁ তুই চাইলে তাই হবে।“ দলপতির কথা কে ফেলতে পারে।

বাপ্পাকে অনেক উজ্জ্বল আর উৎফুল্ল লাগছিল। একটানা দৌড়ের যে ক্লান্তি সেটা চোখ থেকে উবে গেছে। নতুন কিছুর স্বাদ সে পেয়ে গেছে।

“তুই বলে দে আমি আছি, না না সাদেকের ফোন নাম্বারটা দে আমি আজ রাতেই ওকে ফোন করব।পি এইচ ডি ক্যান ওয়েট।”

৮ টা পনেরো। ওকে জোড় করে উঠলাম। না হলে বাজার করে মেয়েকে পিক করতে ওর দেরি হবে। আমার মোবাইলটাও বেজে উঠলো। রিং টোনে বাজছে “আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে”, বউয়ের মোবাইল থেকে কল।

“মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ।” হাসতে হাসতে বাপ্পা ডানে গাড়ির দিকে হাটা দিল। আমি বাম দিক দিয়ে দৌড়ানো শুরু করলাম। কফির সাথে মাড কেকটা মজাই লেগেছিল। খাওয়াটা উচিত হয় নি। রক্তে সুগারের লেভেল শুট আপ করেছে। অন্তত: আধা ঘণ্টা দৌড়াতে হবে। আমার জ্যোৎস্না বনে যাওয়াটা একটু দেরিই হবে। ক্ষতি কি।